

পর্যটন শিল্প এবং শেরপুরের দর্শনীয় স্থান
মো: মোমিনুর রশীদ
জেলা প্রশাসক, শেরপুর।

সৌন্দর্যের পিপাসা মানুষের সেই আদিকাল থেকে। তাইতো মানুষ সৌন্দর্যের সন্ধানে ছুটে চলেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের নেশায় ছুটে চলেছে পৃথিবীর সব প্রান্তে, পাহাড়ের চূড়ায়, সাগর গর্ভে। মানুষের এই ভ্রমণ পিপাসা জন্ম দিয়েছে যে নতুন শিল্প তাই হলো পর্যটন শিল্প। পর্যটন শিল্প এখন শুধু ভ্রমণের বিষয় নয় বরং তা এখন পৃথিবীর অর্থনীতির একটি অন্যতম খাতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনীতি মূলত: পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে মানুষের ভ্রমণ পিপাসা। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ঘটছে পর্যটন শিল্পের বিকাশ। বিভিন্ন দেশ তাদের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে পর্যটন শিল্পের বিকাশে মনোনিবেশ করেছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের পর্যটন শিল্পকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বিশ্বের জিডিপি তে পর্যটন খাতের অবদান ১০.৫ শতাংশ। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি এবং এখাতে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে। পর্যটন খাতকে আকৃষ্ট করতে বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত চলছে নানা আয়োজন। বিশ্বের অনেক দেশের মত পর্যটনের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ। নদী, পাহাড়, বন, সমতলের এই দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্রষ্টার দেওয়া অপার সৌন্দর্যময় বিভিন্ন স্থান।

“বাংলার সবুজ মাঠ, নদী, সাগর, পাহাড়ে,
পাঠিও বিধি আমায় বারে বারে”।

সারা বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল কয়েকটি পর্যটন মার্কেটের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। পর্যটন শিল্প হতে পারে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। প্রতি বছর প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ লক্ষ মানুষ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে। এখাতে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে জিডিপি তে পর্যটন শিল্পের অবদান ৪.০০ শতাংশ। ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ বিদেশী পর্যটক আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তাতে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমনটাই আশাবাদ নীতি নির্ধারকদের।

বাংলাদেশে নদী, পাহাড়, সমুদ্র, বন সহ বিভিন্ন অকৃষ্টিম সৌন্দর্য সম্ভার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সারা দেশে। তেমনি সৌন্দর্যের আধার উত্তরের ছোট জনপদ শেরপুর জেলা।

গারো পাহাড়ের পাদদেশে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার সীমান্ত ঘেঁষা ঘন সবুজ শ্যামল বন, খরস্রোতা পাহাড়ি নদী আর গারো পাহাড়ের সুসমা সৌন্দর্যমণ্ডিত এ জনপদ। পাহাড়ের ঢালে, গায়ে এবং চূড়ায় শাল, গজারি, সেগুন, মহুয়া, আকাশমনি গাছ, বনফুল, তাদের দৃষ্টি নন্দন বিন্যাস ও সবুজ বনানীতে মেঘ রোদ্দুরের খেলা আর নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী গারো, কোচ, হাজংসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকা এ সবই যেন বিশাল ক্যানভাসে সুনিপুণ চিত্রকরের রং-তুলির আঁচড়। শৈল্পিক এ আঁচড় খুব সহজেই নিসর্গ প্রেমীদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে শেরপুরে আসে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঝিনাইগাতী উপজেলায় গজনী অবকাশ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছু দিন পরে বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে নালিতাবাড়ি উপজেলায় মধুটিলা ইকোপার্ক স্থাপিত হয়। এছাড়াও শেরপুরের আরো যে স্থানগুলো পর্যটনের দিক দিয়ে আলোচিত তন্মধ্যে শহরের উপকণ্ঠে অর্কিড পর্যটন, জরিপ শাহের মাজার, বারদুয়ারি মসজিদ, গড় জরিপা দুর্গ, হযরত শাহ কামাল (রা) এর মাজার, কসবার মোঘল মসজিদ, নয়আনি জমিদার বাড়ী, সন্ধ্যা কুড়া রাবার বাগান, বারোমারি খ্রিস্টান মিশন, নীকুগাও স্থলবন্দর, রাজার পাহাড় থেকে বাবেলাকোনা পর্যন্ত সড়ক, সুতানাল দীঘি, বন্যহাতির অভয়ারণ্য নয়াবাড়ির টিলা, পানিহাটা-তারানি পাহাড়, এসবই হলো শেরপুরের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান।

গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সীমান্তবর্তী ভারতের মেঘালয় ঘেঁষা মনোরম শোভামন্ডিত জেলা শেরপুর। পাহাড়ের কোলে বেড়ে ওঠা এ জেলার সরল সাধারণ মানুষেরা প্রাচীনকাল হতে ধারণ করে আসছে জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। পাহাড়ি এ জনপদের বুক চিরে বয়ে গেছে ভোগাই, মহারশি, চেল্লাখালী, কর্ণঝোড়া, ব্রহ্মপুত্র, কংশ, মালিবিসহ অসংখ্য জলস্রোতের রাশি। সারি সারি শাল-গজারি-রাবার বাগান, মাথা উঁচু করে থাকা পাহাড়ি বৃক্ষ রাশি সবুজের মায়ায় আচ্ছাদিত করে রেখেছে ছোট এই জেলাটিকে। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাজার পাহাড়, মেঘালয় ঘেঁষা গজনী অবকাশ কেন্দ্র, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মধুটিলা ইকোপার্ক, অপরূপ মাই সাহেবা মসজিদ, দর্শনীয় বারোমারি মিশন, সুতানাল দীঘি, নাকুগাঁও স্থলবন্দর, সীমান্ত সড়কের অপরূপ দৃশ্য দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে সৌন্দর্য পিয়াসু লোকদের জন্য বিনোদনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গজনী অবকাশ কেন্দ্রে নির্মাণাধীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাদুঘর ও বজ্রবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, পর্যটকদের মনে আনন্দ প্রাপ্তির সাথে এ জেলার কৃষ্টি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে এক গভীর ছাপ রেখে যাবে। শেরপুরের জীবন ও রূপকথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সুন্দর সুগন্ধি জাতের তুলসীমালা ধানের চাল। সেই চালের পিঠা-পায়েস, খই-মুড়ি আর ভাতের সুগন্ধ ও স্বাদের কারণে তুলসীমালা আজ শেরপুরের ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে বিশ্বমঞ্চ অন্দি পরিচিত। পর্যটকদের কাছে মনোমুগ্ধকর শেরপুরকে আরো পরিচিতি করা এবং এ জেলার সুগন্ধি তুলসীমালা চালের সুখ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিবে দিগন্ত পাহাড় ঘেরা এই ছোট জেলাটি।

পাহাড়ি জনপদে গারো, হাজং প্রভৃতি কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। প্রকৃতির অপরূপ লীলা ভূমি সীমান্ত গারো পাহাড়ের সুষমামন্ডিত শেরপুর একটি অতি প্রাচীন জনপদ। দেশের ছোট সুন্দর প্রান্তিক জেলা শেরপুর।

শেরপুরের ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান:

গজনী অবকাশ কেন্দ্র

শেরপুর জেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ঝিনাইপাতী উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের পাদদেশে ‘গজনী অবকাশ কেন্দ্র’ শেরপুর জেলার তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রধান ও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি গজনী ব্রিটিশ আমল থেকেই পিকনিক স্পট হিসেবে পরিচিত। মনোরম পাহাড়ি শোভামন্ডিত গজনীতে একটি প্রাচীন বটগাছের পূর্বদিকে প্রায় ২ শত ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় নির্মাণ করা হয়েছে দ্বিতল অবকাশ ভবন। ওই প্রাচীন বটগাছের বিশাল গোল চত্বরটি শান বাঁধানো। শান বাঁধানো সেই বিশাল বটগাছটির ছায়ায় চারপাশে দলবদ্ধভাবে আনন্দ আড্ডায় মেতে ওঠে পিকনিক দলগুলো। গারো, কোট, হাজং বানাই, ডালু ও হদি উপজাতি অধ্যুষিত গারো পাহাড়ের পাদদেশে স্বচ্ছ-সুন্দর জলের লেক ও দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ বনানীর মাঝে শেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গড়ে তোলা গজনী অবকাশ কেন্দ্রে রয়েছে ৬ কক্ষ বিশিষ্ট উন্নতমানের দ্বিতল রেস্ট হাউজ। সমতল ভূমি থেকে অবকাশ ভবনে উঠানামা করার জন্য পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে দু’শতাধিক সিঁড়িসহ আকর্ষণীয় আঁকাবাঁকা ‘পদ্মসিঁড়ি’। ‘পদ্মসিঁড়ি’র পাশেই গজারি বনে কাব্য প্রেমীদের জন্য কবিতাজ্ঞানের গাছে গাছে ঝোলানো আছে প্রকৃতি নির্ভর রচিত কবিতা। লেকের পানির উপর ভাসমান সুদৃশ্য দ্বিতল জিহান অবসর কেন্দ্র ছাড়াও লেকের মাঝে কৃত্রিম দ্বীপ ও দ্বীপের উপর লেকভিউ পেন্টাগন। দ্বীপে যাতায়াতের জন্য রয়েছে স্টিল রোপের ওপর নির্মিত দোদুল্যমান সেতু। কৃত্রিম লেকে নৌ বিহারের জন্য রয়েছে বিদেশী ‘প্যাডেল বোট’ আর আকর্ষণীয় ‘ময়ূরপঙ্খী নাও’।

পাড়, হাজং কুচ এই তিন সম্প্রদায়ের বসবাস এখানে। অন্য দুই আদিবাসীদের চাইতে গাড়দের জীবন মান সবুজ বেশ উন্নত। মাটি খুঁড়ে পাথর উত্তোলন, নয়ন জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য, মিনি চিড়িয়াখানা, বর্ণার অবিরাম স্রোতধারা সবুজ বনানী বিষণ্ণ মনকেও উৎফুল্ল করবে। গজনী যাওয়ার সড়ক পথে বৃক্ষের নির্মল ছায়া এবং দুই পাশের বিশাল বিলে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য মন মেজাজকে ফুরফুরে করে দেয় নিঃসন্দেহে। সুউচ্চ শীর্ষ পাহাড় চূড়ায় নির্মিত হয়েছে আধুনিক স্থাপত্য রীতিতে ৬৪ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন নয়নকাড়া সাইট ভিউ টাওয়ার। এই টাওয়ার চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে চারদিকে শুধু দেখা যায় ধূসর, আকাশী ও সবুজের মিতালী। সীমান্তবর্তী বনভূমির সবুজ গাছগাছালি। দূরের উপত্যকা ও অধিত্যকা। দূর ঝরনার রূপালী প্রবাহ। এখানে মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশে ভরা পূর্ণিমা রাতের পরিবেশে মোহময়। অবকাশ কেন্দ্রে প্রবেশ পথের রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে সৃষ্ট ঘোড়ার খুরের ন্যায় ক্রিসেন্ট লেকের তীর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত অন্য আরেকটি লেকের তীরে যাওয়ার জন্য পাহাড় ও রাস্তার তলদেশে খনন করা হয়েছে রোমাঞ্চকর সুড়ঙ্গ পথ ‘পাতালপুরী’। ক্রিসেন্ট লেকের মাঝখানে নির্মিত হয়েছে জলপ্রপাত ‘নির্ঝর’। হৃদ পেরিয়ে পশ্চিম পাহাড়ে যেতে চোখে পড়বে বর্ণিল সংযোগ সেতু ‘রংধনু’। ইকোপার্ক, অর্কিড হাউস, মিনি চিড়িয়াখানার হরিণ, বানরসহ আরো অনেককিছুই চোখে পড়বে ভ্রমণ পিপাসুদের। এছাড়া পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে শেরপুরের জলো প্রশাসক মোঃ নাসিরুজ্জামানের প্রচেষ্টায় চলতি মওসুমে নির্মিত হয়েছে সুউচ্চ কৃত্রিম জলপ্রপাত ‘গজনী পবিত্র কুণ্ড’।

রাজধানী ঢাকা থেকে সরাসরি সড়ক পথে সাড়ে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টায় গজনীতে পৌঁছানো যায়। মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে ড্রীমল্যান্ড স্পেশাল সার্ভিস, সাদিকা, মুক্তিযোদ্ধা স্পেশালসহ বিভিন্ন সার্ভিসে ঢাকা হতে শেরপুর আসবেন। এরপর শেরপুর থেকে বাস, মাইক্রোবাস, সিএনজি চালিত অটো রিক্সা বা রেন্ট-এ-কারে ঝিনাইগাতী উপজেলা সদর হয়ে গজনী অবকাশ কেন্দ্রে যেতে পারবেন। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা জনিত কারণে অবকাশ কেন্দ্রের রেন্ট হাউজে রাত যাপনের অনুমতি নেই।

মধুটিলা ইকোপার্ক:

জেলা শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার, নালিতাবাড়ী উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তরে পোড়াগাঁও ইউনিয়নে ময়মনসিংহ বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মধুটিলা ফরেস্ট রেঞ্জের সমশুড়া বনবিটের আওতায় ৩৮০ একর বনভূমিতে গারো পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে সরকারিভাবে বিগত ২০০০ সালে নির্মিত হয় ‘মধুটিলা ইকোপার্ক’ তথা পিকনিক স্পট। স্থাপনকাল থেকেই শীত মৌসুমে এ পার্কে পর্যটকরা ভিড় জমান।

এই পার্কটির প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়বে সারি সারি গাছ। রাস্তার ডান পাশে খোলা প্রান্তর আর দুপাশে রকমারি পণ্যের দোকান। সামনের ক্যান্টিন পার হলেই পাহাড়ি ঢালু রাস্তা। এর পরই হাতি, হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সিংহ, বানর, কুমির, ক্যাঙ্গারু, মৎস্য কন্যা, মাছ ও পাখির ভাস্কর্য।

পাশের ঝাঁকঝাঁক পথে ঘন গাছের সারি লেকের দিকে চলে গেছে। তারপর কৃত্রিম লেকের উপর স্টাররিজ। যা দেখে প্রাণ পায় নব চেতনা, মন হারিয়ে যায় যেন প্রকৃতির মাঝে। লেকে প্যাডেল বোটে চড়ে ঘোরাফেরার পর পাহাড়ের চূড়ায় পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে আরোহণ করলেই নজর কেড়ে নেয় ভারতের উঁচু-নিচু পাহাড় আর সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন ভ্রমণ পিয়াসীরা।

এ ইকোপার্কটি সীমান্তবর্তী হওয়ায় এখান থেকে ভারতের দূরত্ব এক কিলোমিটার। যুগ যুগ ধরে সীমান্তবর্তী এ পাহাড়ে গারো আদিবাসীরা বসবাস করে আসছেন। এখান থেকে খুব সহজে আদিবাসী গারোদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি দেখারও সুযোগ রয়েছে।

রাজার পাহাড় ও বাবেলাকোনা:

সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে রাজার পাহাড়। এ পর্যটন কেন্দ্রটির অবস্থান শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায়। রাজার পাহাড় এলাকার চারপাশ শুধু পাহাড় আর নদী ঘেরা। এ যেন সৌন্দর্যের এক অপূরণ লীলাভূমি। ভারতের মেঘালয় রাজ্য ঘেঁষা অব্যাহত সবুজের সমারোহে রাজার পাহাড়ের অবস্থান। এখানে ছোট-বড় অসংখ্য টিলা। কত যে মনোমুগ্ধকর এলাকা তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। যারা একবার দৃশ্যগুলো অবলোকন করতে পেরেছেন তারাই শুধু অনুভব করেছেন।

এটি গারো পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। কেউ একবার এখানে এলে বারবার আসতে মনকে নাড়া দেবে। প্রায় দেড়শ ফুট উঁচু টিলা। সেখান থেকে দেখা যায় মেঘালয়ের অনেক কিছু। প্রতিদিন এখানে আবেগতড়িত শত শত মানুষের সমাগম ঘটে। জমে ওঠে রাজার পাহাড়। ‘তুলশী মালার সুগন্ধে পর্যটনের আনন্দে’ এই স্লোগানে দেশ-বিদেশে শেরপুরকে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই ব্র্যান্ডিংয়ের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে রাজার পাহাড়।

প্রাচীনকালে সম্ভ্রান্ত রাজ বংশের এক রাজার অবস্থান ছিল এখানে। তার নামেই এখানকার নাম হয় রাজার পাহাড়। রাজার পাহাড়ের আগের সৌন্দর্য নেই। তবে এর বৈশিষ্ট্য আলাদা। প্রতিবেশী পাহাড়গুলোর তুলনায় ব্যতিক্রমী। এখানে অনেক পাহাড়ের মধ্যে রাজার পাহাড়ের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি। এর চূড়ায় শতাধিক হেক্টর ভূমি সমতল। সবুজ আর নীলের সংমিশ্রণ। যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হবে আকাশ ছোঁয়া বিশাল পাহাড়। এর নৈসর্গিক দৃশ্য মনকে করে আবেগতড়িত।

প্রাকৃতিক ভাবেই গড়ে ওঠেছে এ পাহাড়। শীতকালে প্রতিদিন ভিড় হয় হাজারো মানুষের। পরিবেশ হয়ে ওঠে কোলাহলপূর্ণ। এটি পর্যটন কেন্দ্র হলে ভ্রমণ পিপাসুদের চাহিদা পূরণে যোগ হবে নতুন মাত্রা। দেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নের তালিকায় আসবে রাজার পাহাড়। এখান থেকে সরকারের আয় হবে বছরে লাখ লাখ টাকা। প্রতিবেশী গ্রামের বেকারদের জন্য হবে কর্মসংস্থানের নতুন পথ। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদভারে আরো মুখরিত হবে রাজার পাহাড়।

এলাকাবাসী, ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তব্যাক্তিরা জানান, শেরপুর শহর থেকে ৩৪ কিলোমিটার এবং শ্রীবরদী পৌর শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে রাজার পাহাড়। এটি মানুষের জন্য বিনোদন স্পট হিসেবে পরিচিত। সারা বছরই জেলার সদরসহ নকলা, নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদীর স্থানীয় অধিবাসী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা

ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভ্রমণপিপাসু রাজার পাহাড়ের নির্মল পরিবেশে বেড়াতে আসেন। পাশে আদিবাসী জনপদ বাবেলাকোনা। যেন অসংখ্য উঁচু টিলায় ঘেরা অনবদ্য গ্রাম। প্রাচীন কাল থেকে এখানে গড়ে ওঠেছে জনবসতি।

১৯৮০ সালে পাগলা দারোগা নামে জনৈক এক ব্যক্তি রাজার পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতেন। তিনি মারা গেছেন। তার ছেলেমেয়েরা রয়েছে এখানেই। তারা টিলার এক কোনায় গড়ে তুলেছেন কাঁঠাল, লিচু ও কলার বাগান। অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত রাজার পাহাড়ের চারদিকে আছে হরেক রকম প্রজাতির গাছগাছালি। এর চূড়ায় বিশাল সমতল ভূমি। সেখানে যাওয়ার পথ সরু আর অদ্ভুত নির্জন পরিবেশ। যাওয়ার আগেই আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

‘রাজার পাহাড়ের পাশেই চান্দাপাড়া ও বাবেলাকোনা গ্রাম। এখানে গারো, হাজং ও কোচ সম্প্রদায় অধ্যুষিত আদিবাসীদের বসবাস। তাদের জীবনধারায় রয়েছে নানা ধরনের সংস্কৃতি আর ভিন্ন মাত্রার বৈচিত্র্যপূর্ণ। জঙ্গল আর জন্তু জানোয়ারের মিতালী। যেন এ জনপদের চলমান জীবন সংগ্রামের বিরল দৃশ্য।’

‘এখানে রয়েছে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, সংরক্ষণ ও চর্চার কেন্দ্র বাবেলাকোনা কালচারাল একাডেমী। রয়েছে জাদুঘর, লাইব্রেরি, গবেষণা বিভাগ ও মিলনায়তন। উপজাতিদের কারুকার্যমন্ডিত ধর্মীয় গির্জা, মন্দির, উপাসনালয় ও অসংখ্য প্রাকৃতিক নিদর্শনের সমাহার।’ এখান থেকে আদিবাসীদের সম্পর্কে জানা যায় অনেক কিছুই। মিশনারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হচ্ছে এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আদিবাসী সম্প্রদায়ের চালচলন, কথাবার্তা ও জীবন প্রণালি দর্শনাথীদের আরো আকৃষ্ট করে।

আদিবাসীদের সংস্কৃতিতেও রয়েছে ভিন্নতা। জীবন যেন প্রবাহিত ভিন্ন এক ধারায়। বর্ষাকালে কর্নঝোড়া ঢেউফা নদীর জোয়ারে কানায় কানায় ভরে ওঠে। কিন্তু দিনের শেষে ভাটা পড়ে শুকিয়ে যায় নদীর পানি। এর বুক জুড়ে রয়েছে বিশাল বালুচর। যার নির্মাণকাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শহরে। এটি যেন পাহাড়ের কোল ঘেঁষা বিকল্প সমুদ্র সৈকত। এ পাহাড়ের পাশে রয়েছে বিডিআর ক্যাম্প, ফরেস্ট বিট অফিস, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস ও রাবার বাগান।

পানিহাটা লেক ও তারানি পাহাড়:

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশের চির সবুজ প্রকৃতি সর্বদা আকর্ষণ করে প্রকৃতি প্রেমী মানুষদের। দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পাহাড়-নদী, খাল-বিল ও সবুজ অরণ্যঘেরা প্রকৃতি। তেমনি একটি স্থান শেরপুরের পানিহাটা-তাড়ানি পাহাড়।

পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় এই স্থানটির অবস্থান শেরপুর জেলায়। শেরপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার এবং জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলা শহর থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় এলাকার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নে অবস্থিত পানিহাটা-তারানি পাহাড়। মূলত পানিহাটা গ্রামের একটি অংশে রয়েছে তারানি গ্রামের পাহাড়। আর এ দুয়ে মিলেই পর্যটকদের কাছে এ অঞ্চলটির পরিচিতি গড়ে উঠেছে পানিহাটা-তারানি পাহাড় নামে।

প্রকৃতিপ্রেমীদের প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় এলাকার অপরূপা পানিহাটা-তারানি পাহাড়। মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি দৃশ্য যে কোন প্রকৃতি প্রেমীর মনকে কাছে টানে। উত্তরে ভারতের তুরা পাহাড়কে আবছা আবরণে ঢেকে আছে মেঘ-কুয়াশা। দূরের টিলাগুলো মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলছে যেন। তুরার অববাহিকা থেকে সামনে সোজা এসে পশ্চিমে চলে গেছে পাহাড়ি নদী ভোগাই। নদীর একপাশে শত ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজে জড়ানো পাহাড়। নদীর টলটলে পানির নিচে নুড়ি পাথরগুলো ঝিকমিকি করছে।

সামনের একশ গজ দূরে ভারত অংশে আঁকাবঁকা রাস্তা দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে মাঝেমধ্যেই হসহাস করে ছুটে চলছে মালবাহী ট্রাকগুলো। চতুর্দিকে ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়ের সারি। পূর্বদিকের কয়েকটি পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভোগাই নদীতে মিশেছে একটি ঝর্ণা। সেগুন, গজারিসহ নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজির সমাহার আর বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কিচিরমিচির সারাক্ষণ লেগেই থাকে এখানে। বর্ষায় পাহাড়ের নিচু অংশ পানিতে ভরে গেলে সেগুলোকে অপূর্ব লেকের মতো মনে হয়।

পাহাড়ের পূর্ব পাশে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। আর পাহাড়ের পাশেই রয়েছে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়, ছোট একটি চিকিৎসা কেন্দ্র, বিদ্যালয় আর ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য হোস্টেল।

প্রতিদিনই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন দর্শনাথীরা। এখানে রয়েছে পিকনিক করার জন্য মনোরম পরিবেশ।

অর্কিট পর্যটন কেন্দ্র:

সবুজের সাথে মিতালি করতে চাইলে চলে আসুন শেরপুরের অর্কিট পর্যটন কেন্দ্র। শেরপুর জেলা শহরের মধ্যেই ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে অর্কিট পর্যটন কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের চারিদিকে রয়েছে সারি সারি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির সবুজ গাছ, মাঠ জুড়ে রয়েছে সবুজ ঘাস আর আছে সান বাঁধানো পুকুর। সাদা বক পুকুরে চারপাশে বসে থাকে মাছ খাওয়ার জন্য। সবুজ বাতায়নে অর্কিড প্রাঙ্গণে খাঁচায় খেলা করছে বানর, টার্কি, খরগোশসহ দেশীয় বিভিন্ন জীবজন্তু। প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি করতে ক্লান্ত মন কখনো কখনো শান্তির জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় একটু প্রশান্তি প্রয়োজন। সকল ব্যস্ততা ফেলে পরিবার নিয়ে ঘুরতে ইচ্ছে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মিতালী এবং মনের প্রশান্তির এক অপূর্ব সুযোগ শেরপুরের অর্কিড পর্যটন প্রকল্প।

অর্কিড পর্যটন প্রকল্পের শোভা বর্ধনে চারিদিকে লাগানো হয়েছে সারি সারি দেশি-বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, মাঠ জুড়ে রয়েছে মেশিনে কাঁটা একই মাপের বিশেষ সবুজ ঘাস, চোখ ধাঁধানো নির্মল স্বচ্ছ পানির পুকুর আর শান বাঁধানো জমিদারি পুকুর ঘাট। পুকুরের চারপাশে মাছ শিকারে আসে সাদা বক। সবুজের ওই অর্কিডের খাঁচা থেকে আনন্দ দেয় বানর, টার্কিশ, খরগোশসহ দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং জীবজন্তু। সারা অর্কিড জুড়ে নানা প্রজাতির বাহারি থোকা থোকা ফুল অপেক্ষায় আছে দর্শনার্থীদের নির্মল আনন্দ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য।

অর্কিডে হাটার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে সরু রাস্তা। আর রাস্তাগুলোতে ইটের উপর মনের মাধুরী মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে রং। সব মিলিয়ে এ যেন এক স্বপ্নপুরী!

প্রিয়জন অথবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় বড় ছাতা এবং বসার জন্য চেয়ার। চা, কফি ও কোমল পানীয় পানের জন্য রয়েছে ছনের তৈরি ব্যতিক্রমী সুদৃশ্য ক্যান্টিন এবং রেস্ট হাউজ। এ যেন ইট বালুর যান্ত্রিক শহরের মধ্যে মন খুলে আনন্দ করার এক লীলাভূমি। পরিবার-পরিজন বা প্রিয়জন নিয়ে বেড়ানো ও প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি করার বা শহরে জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে চমৎকার একটি বিনোদন কেন্দ্র।

কর্ণঝোড়া:

ভারত থেকে নেমে আসা নদীর নাম কর্ণঝোড়া। সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামের নাম মেঘতলা। সবুজে ছাওয়া ছবির মত এক গ্রাম। দূরের পাহাড়ের চূড়াটা টেবিল মাউন্টেনের মত সমতল। নাম রাজা পাহাড়। স্থানীয়রা বলে ‘আজা পাহাড়! কর্ণঝোড়া রাবার বাগান শেরপুর জেলার শ্রীবরদীতে অবস্থিত। অপরূপ সৌন্দর্যের এই রাবার বাগানটি সত্যি ভাল লাগার। এখানকার সৌন্দর্য ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য আকর্ষণীয়।

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী:

শেরপুর জেলার পাঁচটি উপজেলাতেই কমবেশি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের বসবাস। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গারো, কোচ, হাজং, হদি, বানাই, বর্মণ উল্লেখযোগ্য। তাদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভ্রমণ পিপাসু মানুষ শেরপুরে বেড়াতে এসে ইহ সংস্কৃতি খুব কাছে থেকে দেখতে পারে।

সীমান্ত সড়ক:

গারো পাহাড়, সবুজ বনানী, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য স্পর্শ করে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের উঁচু-নিচু টিলা মাড়িয়ে এগিয়ে চলা সীমান্ত সড়ক ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মূলত সুনামগঞ্জ থেকে জামালপুর বকশিগঞ্জের ধানুয়া জামালপুর স্থলবন্দর পর্যন্ত ১৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ ২ লেনের সড়কটি সীমান্ত সড়ক নামে পরিচিত।

পনে তিন আনী জমিদার বাড়ী:

শেরপুর জেলা সদরে অবস্থিত জমিদার সতেন্দ্র মোহন চৌধুরী ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন চৌধুরীর বাড়িটি পোনে তিন আনী জমিদার বাড়ি (Pone Ten Ani Jamidar Bari) হিসাবে সুপরিচিত। গ্রিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এই বাড়িটি অন্যান্য জমিদার বাড়ি থেকে আলাদা। যদিও কালের বিবর্তনে জমিদার বাড়ির অনেক সৌন্দর্যই হ্রাস হয়ে গিয়েছে তবে জমিদার বাড়ির চমৎকার নকশাকৃত দৃষ্টিনন্দন স্তম্ভগুলো আজো জমিদারী আমলের ঐতিহ্য বহন করে চলছে। স্তম্ভগুলো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এবং এতে বর্গাকৃতির ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে।

পোনে তিন আনী জমিদার বাড়ির ভিতরে অবস্থিত মন্দিরের সুপ্রশস্ত বেদি, প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে অলংকৃত স্তম্ভ ও কার্নিশের মোটিভও নজরে পড়ে। বাড়ির দেয়ালের আন্তরণ ও পলেস্তারে চুন-সুড়কীর ব্যবহার লক্ষণীয়। জমিদার বাড়ির ছাদ গতানুগতিক লোহার রেলিংয়ের সাথে চুন সুড়কীর ঢালাই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়া জমিদার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণের রংমহলের স্থাপত্যশৈলীতে লতা-পাতা ও ফুলের নকশাকৃত জমিদারী গাভীর্য্য ও নান্দনিকতা ধরা পড়ে। এই রংমহলে নাচ-গান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। জমিদার বাড়ির সামনে শান বাধানো ঘাটসহ একটি পুকুর রয়েছে।

মাই সাহেবা মসজিদ:

ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলা শহরে পা রাখলে প্রথমেই যে পুরোনো ঐতিহ্য চোখে পড়বে তার নাম মাইসাহেবা মসজিদ। চোখ বন্ধ করে শেরপুরের নাম নিলেও এই মাইসাহেবা মসজিদটি ভেসে আসে দর্শনার্থীদের নজরে। পর্যটকদের কেউ শেরপুর যাবেন আর মাইসাহেবা মসজিদ দেখবেন না, এমন হয় না।

আনুমানিক আড়াইশ' বছর আগে নির্মিত হয় মসজিদটি। তবে আধুনিক সংস্করণেও রয়েছে ঐতিহ্যের ছাপ। এর দুই পাশের সুউচ্চ ২টি মিনার চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। মাইসাহেবা মসজিদের সুউচ্চ মিনার শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখা যায়। মসজিদ এলাকায় প্রবেশের জন্য রয়েছে বিশাল দৃষ্টিনন্দন গেইট।

মসজিদটির নামকরণ নিয়ে প্রচলিত রয়েছে একটি ঘটনা। শেরপুরের তিনআনি জমিদার মুক্তাগাছার ষোল হিস্যার জমিদারকে দাওয়াত করেন। দাওয়াতের উত্তরে মুক্তাগাছার জমিদার শেরপুরে একটি জায়গা চান যেখানে তিনি বিশ্রাম করবেন। সে সময় এখানে জমিদারের খাজনা আদায়ের ঘরসহ পাশে আরেকটি ঘর ছিলো, জমিদার এলাকাটি মুক্তাগাছার জমিদারকে দেবেন বলে মনস্থির করেন এবং হাতি দিয়ে ঘরগুলো ভেঙে দেওয়ার আদেশ করেন। কিন্তু হাতিটি ঘর ভাঙতে ঘরের কাছে যায়, তখনই সালাম দিয়ে বসে যায়। অদ্ভুত এ খবর শুনে তিনআনি জমিদার এসে দেখেন ঘরের ভেতরে একজন নারী ইবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন। জমিদার বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং ক্ষমা চেয়ে ফেরত যান। সেই নারীর নাম ছিল মাইসাহেবা। মাই সাহেবার মৃত্যুর পর জমিদার এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে মাইসাহেবা জামে মসজিদ নামকরণ করেন।

মসজিদটি শেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র শেরপুর সরকারি কলেজের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। তিনআনি বাজার বা কলেজ মোড় থেকে জামালপুর বাসস্ট্যান্ড রোডে প্রবেশ করলেই হাতের ডান পাশে ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি অবস্থিত। বিশাল এই মসজিদের সামনের অংশে অনেক জায়গা রয়েছে। এখানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর শহরে প্রবেশের পর যে কারও দৃষ্টি কাড়ে মসজিদটি।

মাইসাহেবা মসজিদে লোকজন প্রচুর দান করেন। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও এখানে দান করেন নিয়মিত। দিনমজুর থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী, ভিক্ষুকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এখানে দান করে তৃপ্তিবোধ করেন। বিশেষ করে এ রোডে চলাচলকারী পাবলিক পরিবহনের ড্রাইভাররা দিনের শুরু এবং শেষভাগে নিয়মিত দান করেন।

মসজিদটি তিনতলা ভবন। নিচতলা সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। এখানে একসঙ্গে প্রায় ৯ হাজার মুসল্লি জামাতে নামাজ আদায় করতে পারেন। প্রতি শুরুবার জেলার বাইরে থেকে হাজার হাজার মুসল্লি জুমার নামাজের শরিক হতে আসেন।

বারোমারি মিশন:

শেরপুর শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তঘেষা নৈসর্গিক পরিবেশে পাহাড়ি উপত্যকায় বারোমারি মিশন অবস্থিত। চত্বরে ফাতেমা রানীর তীর্থস্থল। শেরপুরের নালিতাবাড়ির বারোমারি খ্রিস্টানদের তীর্থস্থল এটি। ১৯৯৭ সালে পর্তুগালের ফাতেমানগরের আদলে ও অনুকরণে এ তীর্থস্থল স্থাপন করা হয়। এটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোর মধ্যে একটি।

প্রতি বছরই ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা এখানে কম বেশি ভিড় জমান। খৃষ্টানদের পবিত্র এই উপাসনালয়টি যেন অপরূপ সৌন্দর্যের হাতছানি দিয়ে পর্যটকদের আহ্বান করে।

যেভাবে যাবেন শেরপুর:

ঢাকা থেকে সরাসরি বাসে, মাইক্রোবাস অথবা প্রাইভেট কারে শেরপুর যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে নিজস্ব বাহনে মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। ঢাকার মহাখালি থেকে বাসে শেরপুর আসা যায়। আর ট্রেনে আসতে চাইলে ঢাকা থেকে জামালপুর আসতে হবে। জামালপুর ট্রেন স্টেশন থেকে লোকাল বাস, টেম্পু অথবা সিএনজি চালিত অটোরিকশায় সহজেই যাওয়া যায় শেরপুর। শেরপুর শহর থেকে শেরপুরের বিভিন্ন উপজেলায় দর্শনীয় স্থানে যেতে হলে লোকাল বাস, টেম্পু, সিএনজি চালিত অটোরিকশায় বা ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেলে করেও যাওয়া যায়। শেরপুর সদর থেকে সময় লাগে দূরত্ব ভেদে ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা।

আবাসন ও আবাসিক হোটেল:

ভ্রমণ পিপাসু কেউ যদি শেরপুর এসে রাত্রিযাপন করতে চান তবে শেরপুর জেলা সদরেই থাকতে হবে। কারণ সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় এলাকার কোনো স্পটেই রাত্রিযাপনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া ঝিনাইগাতী, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরদী উপজেলা সদরে রাত্রিযাপন করার মতো কোনো ভালো আবাসিক হোটেল এখনো গড়ে ওঠেনি। শেরপুর শহরে ভাল মানের ৪ থেকে ৫ টি আবাসন হোটেল ছাড়াও ভিআইপিদের জন্য জেলা সার্কিট হাউজ, জেলা পরিষদ ও এলজিইডির রেস্ট হাউজ রয়েছে। ঝিনাইগাতী ডাক বাংলোতে অথবা বন বিভাগের ডাক বাংলোতেও থাকতে পারবেন। এছাড়া শহরের আবাসিক হোটেলগুলোর মধ্যে রয়েছে হোটেল সম্পদ ও কাকলি গেস্ট হাউজ অন্যতম।